ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস

বিমূর্ত সংলাপ

বিমূর্ত সংলাপ

তপনকুমার বিশ্বাস

BIMURTA SANGLAP
A Collection of Bengali Poems
By Dr. Tapan Kumar Biswas
Mobile: 9433125195
বিমূর্ত সংলাপ
(কাব্যগ্রন্থ)
লেখকঃ ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস
গ্রন্থস্বত্বঃ ডাঃ দীপালি বিশ্বাস
সরোজ পার্ক, বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৪
Copy Right:
Dr. Dipali Biswas
Saroj Park, Barasat, Kolkata-700124
প্রকাশকঃ আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা
মূল্যঃ ১০০ টাকা
প্রথম প্রকাশঃ মার্চ ২০২১
কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা
Publisher: Ananda Prakashan, Kolkata
Saroj Park, Taki Road, Barasat, Kolkata-700124
Price: Rs 100
First Edition
Date of Publish: March 2021
Kolkata International Book Fare
ISBN: 978-93-8925-873-8
প্রচ্ছদঃ সমীর মজুমদার
লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থঃ
কাব্যগ্রন্থ-
ফিরে আসা
জেগে আছি
জনারণ্যে পদাতিক
রঙিন কাঁচঘর
অদম্য
বিমূর্ত সংলাপ
ভ্রমণ কাহিনিঃ
মিশর- মমি পিরামিড ও নীল নদের দেশে
গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধসঙ্কলনঃ
আবেগ ও অন্দর
প্রাপ্তিস্থানঃ আনন্দ প্রকাশন,কলকাতা; আদি পাল ব্রাদার্স, কে কে মিত্র রোড, বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

উৎসর্গ

মা' কে

ভূমিকা

করোনা ভাইরাসের কবলে যখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ দিশেহারা, চারিদকে আতঙ্ক - মৃত্যুমিছিল সেই ক্রান্তিকালে ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাসের লেখা কাব্যগ্রন্থ 'বিমূর্ত সংলাপ' প্রকাশিত হচ্ছে। মানুষের ইতিহাসের এই চরমতম দুঃসময়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন লেখক। মানুষকে সচেতন করা, দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা, করোনা রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করানো, চিকিৎসক সংগঠনের সকলকে নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো – এ সকল বিষয় ছাড়াও করোনা যোদ্ধা সহ সকলকে করোনা টীকা দেওয়ার মতো বিশাল কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত রয়েছেন।

এত ব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করে লিখেছেন তার অষ্টম গ্রন্থ 'বিমূর্ত সংলাপ'। করোনায় মানুষের মধ্যে বিপর্যয় নেমে এসেছে – মনে, সংসারে, প্রেমে, অর্থনীতিতে ও জীবনযাত্রায়। এই গ্রন্থটির অনেকগুলি কবিতায় তা ছুঁয়ে গেছে । একদিন করোনা হয়তো থাকবে না। তখন পাঠক এই কবিতাগ্রন্থে খুঁজে পাবেন করোনা কালে মানুষের আবেগ ও আতঙ্ক ।

আশা করি পাঠক মনে লেখকের এই অষ্টম প্রয়াস রেখাপাত করবে।

ডাঃ দীপালী বিশ্বাস
সরোজ পার্ক
কলকাতা- ৭০০১২৪
২১শে মার্চ ২০২১

লেখক পরিচিতি

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস এমবিবিএস, এফসিজিপি(দিল্লী)

সভাপতি, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বারাসাত শাখা ।

সভাপতি, সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বারাসাত ।

রাজ্য সভাপতি(২০১৮-২০১৯),ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় রাজ্য কমিটি

আজীবন সদস্য, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি ।

আজীবন সদস্য, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ।

প্রাক্তন পৌরপ্রধান পারিষদ, বারাসাত পৌরসভা ।

প্রাক্তন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল ।

প্রাক্তন সম্পাদক, ইয়োর হেলথ, সর্বভারতীয় স্বাস্থ্য পত্রিকা- আই এম এ

প্রাক্তন সদস্য, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ।

প্রাক্তন সভাপতি, স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বারাসাত আঞ্চলিক কমিটি।

প্রাক্তন সভাপতি, বিজিনেস মেন্স অ্যাসোসিয়েশন, টাকি রোড, বারাসাত ।

লেখকের গ্রন্থঃ

কাব্যগ্রন্থঃ

ফিরে আসা

জেগে আছি

জনারণ্যে পদাতিক

রঙিন কাঁচঘর

অদম্য

বিমূর্ত সংলাপ

ভ্রমণকাহিনিঃ

মিশর- মমি পিরামিড ও নীল নদের দেশে

গবেষণামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধসঙ্কলনঃ

আবেগ ও অন্দর

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস পেশায় একজন চিকিৎসক ।

তিনি একজন দক্ষ সংগঠক, সমাজসেবী, সুলেখক ও সুবক্তা ।

তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সর্বভারতীয় স্বাস্থ্য পত্রিকা 'ইওর হেলথ'এর সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন ।

তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত আই এম এর 'নিউজ ম্যগে'এ নিয়মিত লেখেন ।

তার ছোটোবেলা থেকেই লেখার অভ্যাস । তিনি স্কুল ও কলেজের পত্রিকাতেও নিয়মিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন ।

তার কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি আটখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তারমধ্যে ছয়টি কাব্যগ্রন্থ 'ফিরে আসা', 'জেগে আছি' 'জনারণ্যে পদাতিক', 'রঙিন কাঁচঘর', 'অদম্য' ও 'বিমূর্ত সংলাপ।' মিশর ভ্রমণ নিয়ে তার লেখা 'মিশরঃ মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে' পাঠকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । এই বইখানি প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ । মিশরের বিশদ ইতিহাস, ভৌগলিক বর্ণনা ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত সব রয়েছে বইখানিতে ।

লেখকের 'অন্তর অন্দর' তার অন্যতম একটি সংযোজন । মানুষের আবেগ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন গভীর ভাবে । ব্যক্তি ও সমাজে মানুষের আবেগের প্রতিফলন ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন দীর্ঘ দিন । তার গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ব্যক্ত করেছেন এই গ্রন্থটিতে ।

তিনি একজন প্রচণ্ড ভ্রমণপিপাসু মানুষ। তিনি ভারত বর্ষের প্রায় সকল রাজ্য, বড়ো বড়ো শহর ও দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করেছেন সাংগঠনিক, পেশাগত কারণে ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ।

তিনি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেনঃ মিশর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া, রাশিয়া, চিন, হংকং, উজবেকিস্তান, ম্যাকাউ, ওমান, ইউরোপের - গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, লিচেনস্টেন, ইতালি, ভ্যাটিকান সিটি প্রভৃতি ।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস ১৯৫৫ সালের ৮ই জুলাই পূর্ববঙ্গের যশোর জেলার বাগডাঙ্গা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । তার বাবা শ্রী হরিদাস বিশ্বাস ১৯৯৪ সালের ২৫শে নভেম্বর পরলোক গমন করেন । তার বাবা ছিলেন বিশেষ সমাজসেবি ও পরোপকারি মানুষ। সমাজে তাঁর অবদানের কথা এখনও মানুষ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে । ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস তার বাবার আদর্শে বড় হয়েছেন শৈশবকাল থেকেই । তার মা শ্রীমতি নিশারানী বিশ্বাস ২০২০ সালের ১৪ই মার্চ পরলোক গমন করেন। তার বাবার মৃত্যুর পর দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর তার মা ছিলেন তার পরিবারের অভিভাবক ও তার দার্শনিক ।

ডাঃ দীপালীর সঙ্গে ১৯৮৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তার বিবাহ হয়। তার স্ত্রী ডাঃ দীপালী বিশ্বাস তার সকল কর্মপ্রেরণার উৎস সকল সময়েই ।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাসের দুই ছেলে । বড়ো ছেলে ডাঃ রাজেশ বিশ্বাস কলকাতা মেডিকেল কলেজের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ।

ছোটো ছেলে শ্রী মুকেশ বিশ্বাস একজন ইঞ্জিনিয়ার । তিনি আই আই টি রুড়কি থেকে ইন্টেগ্রেটেড এম টেক পাশ করেন । বর্তমানে তিনি জার্মানির বার্লিনে একটি নামী কোম্পানিতে কন্সালট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন ।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস চিকিৎসা পেশার বাইরে সমাজ সেবার সঙ্গে নিযুক্ত থাকেন। সদালাপী ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস একজন জনদরদী চিকিৎসক ও সমাজসেবী হিসাবে মানুষের নিকট পরিচিত । অমায়িক ব্যবহার ও পরোপকারী মানসিকতার জন্য সকলের নিকট তার আলাদা ভাবমূর্তি রয়েছে ।

তিনি চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ১৯৯৩ সাল থেকে জড়িত। শাখাস্তর থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেছেন। তিনি বঙ্গীয় রাজ্য আই এম এর রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি দেশের বাইরে ও সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সমাজ সচেতনতা বিষয়ে বক্তৃতা করতে যান । তিনি রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত। তিনি দুঃস্থ শিশু ও মহিলাদের চিকিৎসা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা ও পরিষেবা প্রদান করে থাকেন ।

তিনি আরও কয়েকজন সমাজসেবীকে সঙ্গে নিয়ে সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন যেখানে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়মিত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় । নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয় । সেখানে তিনি বয়স্ক নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা সহ অন্য বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা প্রদান করেন । তিনি আই এম এ বারাসাত শাখায় বয়স্ক চিকিৎসা কেন্দ্র শুরু করেন। সেখানে প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

বর্তমান করোনা ভাইরাস আক্রমণের সময়ে তিনি গরিব মানুষের মধ্যে অর্থ বিতরণ করছেন । করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সাধারন মানুষের প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । বিভিন্ন সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে এ সময়ে মানুষের মনোবল বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন । তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক করোনা রোগীর চিকিৎসা করছেন। চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে করোনা মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক কাজ করছেন । বর্তমানে সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা টিকা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত আছেন। আগামীতে সাধারণ মানুষের জন্য করোনা টিকা দেওয়ার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের কাজ শুরু করেছেন।

-- প্রকাশক।

সংযত স্রোতোজল

পতঙ্গ যেমন কচি পাতায় ইচ্ছে লিখে যায়
লালমাটি যেমন দুর্লভ ভালোবাসা ধরে রাখে
ধুসর ধুলিকণায়,
আমি তেমনি বেরিয়ে পড়ি
নিশুতি সুখের সন্ধানে ।
তুমি যতবার জিজ্ঞেস করেছ,
' কি ভালোবাসো
-পাহাড় না সাগর?'
আমি ততবার বলেছি,
'আমার সেরা ঠিকানা
তোমার হাতের লাল ঝিনুক '।
তুমি অতৃপ্ত থেকেছ।
একটা কথা বলবে মানসী,
'কোথায় বেড়াতে যাবে?
কারবালা না কারাকোরাম?'
কোনোদিন সোজা উত্তর দিলে না।
আজ তো বল একবার,
'কে তুমি ?'
তোমার সেই এক সুর-
'নারী কোনোদিন ক্রীতদাসী হয় না।
নারী কোনোদিন প্রতিদান দিতে ভোলে না'।
- আমার তোতাপাখিটি
তুমি ফেরত দিলে না।

নির্ঘোষ

(করোনা টিকা আবিষ্কারের পূর্বাহ্নে)

নির্ঘুম জেগে থাকি যখন অভুক্ত রাতে
অন্য একটা গল্পের শ্রদ্ধাঞ্জলি হাতে
আজ রাতে গভীর ঘুম আসবে আমার
প্রতিষেধকের আগাম বার্তা দিয়েছে ডাকপিওন ।

রোমের ভীরু ক্যাথেড্রালে ঘন্টা শুনি
প্রহরী দরজা আগলে পাহারায়
আমিও সারারাত
একটি কালো বেড়ালের সন্ধানে ।

পুত্রবধূকে বলেছি,
আমার আর সময় হবে না
আমার সকল পুত্রের যত্ন নিও ।
আমাকে যেতেই হবে
আশার প্রদীপ জ্বালাবো বিষাদভুমিতে।
হাজার অসহায় নরনারী চেয়ে আছে
শঙ্কিত সন্তানের চোখে ।

গবেষক এখনও
একটি চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে যন্ত্রে।
একাকিত্বের সাধনা শেষে
অবসন্ন রাত বলে গেল,
আতঙ্কিত পরিজন
শয্যা ত্যাগ করেছে।
এসো
প্রভাত সঙ্গীত শুরু কর
সূর্যের ক্লান্তি শোভা পায় না।

আত্মমগ্ন

(করোনাকালে লেখা)

নতজানু ক্রীতদাস
শেকলে লিখে রাখে জীবনের
ব্যথা আর বৃত্তান্ত,
স্পার্টাকাস সহযোদ্ধাকে খুন করে বেঁচে থাকে
রোমের কলোজিয়ামে ।
আমিও আমার ঘাতকের গন্ধ খুঁজি
রক্ত মাখা রুমাল উড়িয়ে।
পেয়েও যাব সামনের আশ্বিনে কিংবা কার্তিকের উৎসবে।

ভাঙা মানুষের মনগুলো
জোড়া লাগবে আবার,
বাংলার মধুমিতা একটা শিউলি গাছ পুতবে
অক্সফোর্ডের বাগানে ।
লন্ডনের এলিনা আসবে কন্যাকুমারীতে,
আমাদের সমুদ্রস্নান হবে
গোয়ার নরম বিভাজিকায়।

যদি দেশ ভুলে যেতে পারতাম সে অবসরে,
যদি গায়ের রঙ ভুলে যেতে পারত ওরা !
- কে সাদা, কে কালো !
মৃত্যুমিছিল পেরিয়ে এলে
নতুন জীবন তো এমনি করেই কথা বলে।

কণিকা

(করোনাকালে লেখা)

কণিকা,
থেকে যাও আজ রাতে
তোমার খোঁপায় দেব রক্তকরবী,
ভিজব দুজনে পূর্ণিমা শ্রাবণ বর্ষায় ।
কাঁদছে মানুষ আইসোলেশনে
কাঁপছে গবেষক
মুঠোয় নিয়েছে নিষিদ্ধ ভাইরাস।
সাতশো কোটি বিপন্ন প্রাণ
এক কাতারে দাঁড়িয়ে আছে
রাশিয়ার উঠোনে জায়গা নেই।
অক্সফোর্ডের ছাদে তিল ঠাঁই নেই।
মুম্বইয়ে ধারাভির মানুষ
মাথায় বেঁধেছে লাল রুমাল।
চেয়ে দেখো,
অন্ধকার জাহাজে
একে একে জ্বলে উঠছে আলো।
সেই থেকে পৃথিবীটা কাঁধে বয়ে হাঁটছি,
থেকে যাও
আজ অথবা কাল
অথবা পরশু
যে কোনো রাতেই বেজে উঠবে দুন্দুভি।
একটি শিশুও ঘুমোবে না
ব্রাজিল থেকে ভারত
উগান্ডা থেকে ইউরোপ
মিষ্টিমুখ হবে নৈশ কনসার্টের তালে।
সাতশো কোটি মানুষের
সাতশো কোটি আনন্দ মুখে মিষ্টি তুলে দিও, কণিকা।

নিষ্ক্রমণের প্রান্তে

(করোনাকালে লেখা)

কতবার নির্বাক হয়েছি
উপহাস এসে তাড়া করেছে
সাধন ভুলে পথের মোড়ে আসন পেতেছি
মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত স্বজনের ভিড়ে।

গবেষক দাঁত চেপে লড়ছে মধ্যরাতেও।
আকাশবাণীতে ঈভা নাগ বলেছে-
মানব শরীরে পরীক্ষা চলছে।
সারাহ্ গিলবার্টের মুখে আলো ফেলছে সাংবাদিক।
তোমরা দেখেছ কি
এয়ার হোস্টেসের ভয়ার্ত মুখে হাসি?
গোষ্ঠী সংক্রমণে তৎপর হল আতঙ্ক
নিষ্ক্রমণের পথ হল সংকীর্ণ।

আমি হয়ে উঠি সাবালক
সকলকে অবাক করে বললাম,
আমি পূর্ণ সবাক, আমিও প্রস্তুত।

তোমরাও ভেবে দেখতে পারো
আমার কাছে আসবে কিনা
চারপাশে মৃত্যুর হিশহিশ শব্দ
ভয় বলে কিছু নেই আর অবশেষ
সুগন্ধি মেখেও আসতে পারো
প্রিয়জন সঙ্গী করে।

প্লাটফর্ম -১

(করোনাকালে লেখা)

শূন্য প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কাব্য লেখে তরুণ,
ক্লান্ত ভবঘুরে ঘুমিয়ে পড়েছে
সেও জানে থমকে আছে বোবা রেলগাড়ি।
নতুন আবরণে আড়ষ্ট মুখ-
পথ হারিয়েছে রমণীর ইঙ্গিত-
পথ হারিয়েছে রমণীর ইশারা।
তরুণী কেঁদে বলে, ঈশ্বর
কবে ফিরে পাব রঙিন ওষ্ঠের স্বাধীনতা?

তরুণী প্ল্যাটফর্মে কবিতা বুকে চেপে থাকে প্রাণপণে
-'আমি বাঁচবো না তোমার কবিতা ছাড়া'
তরুণ কবি কবিতা পড়ে চলে
'প্রেম লেখা আছে ছিন্ন পত্রে
অলক্ষ্যে শুধু মৃত্যুর কথা।'
তরুনী আরও দুর্বোধ্য কবিতা লেখে
নির্জন প্লাটফর্মের দেয়ালে।

প্লাটফর্ম -২
(করোনাকালে লেখা)

আজ দুপুরে তুমি হাসলে
তোমার হাসি পুষ্কর দিঘির টলমল জল।
স্বচ্ছ ভূগোল থেকে বিকেল পাঁচটার পৃথিবী,
ছিন্ন পাতার নষ্ট ইতিহাস
সব তোমাকে দিলাম।
সুনয়নী,
আমিও ভুলে যাবো একদিন
পুরনো মন্ত্র।
তুমি বুঝতে পারো? -
কেন খুঁজেছি মিশরের হাইরোগ্লাইফিক্স
ফারাওয়ের ধ্বংসাবশেষ?

তুমি কি জানো সবাই পৌঁছে গেছে মাঠে?
শিখে নিয়েছে নতুন পাঠ?
বেরিয়ে এসো পুরনো প্রাচীর ভেঙে
এভাবেই বাঁচতে হবে
নতুন শতাব্দী এগিয়ে আসছে
নতুন পঞ্চতন্ত্রে পাঠ নাও
চেয়ে দেখো -
নতুন ভূগোলে হাজারো মানুষের ভিড়।
প্লাটফর্মের তরুণ তরুণীও
এইমাত্র মিশে গেল জনতার ভিড়ে।

শিয়রে শরতের শব্দ

(একটু একটু করে বেঁচে থাকার অভ্যাস করছে মানুষ)
(করোনাকালে লেখা)

তোমার চোখে আগমনীর পদাবলী
তোমার বুকে সমুদ্রের গন্ধ-
শরৎ আসলেই বলে ওঠে নন্দিনী।

শরৎ মেঘের গান শুনতে পাচ্ছ?
মারী ও মড়ক যতই আসুক
তোমাকে নাকছাবি দেব এ ভরা ভাদরে।
ঘাসের ডগায় যখন কাশফুল বড়ো হবে
তখন তোমাকে কোমরবিছে পরাব ।

কুমোরবাড়ির রাঙাবউ যেদিন
উঠোনে আলপনা দেবে
তোমাকে পুজোর শাড়ি কিনে দেব লালপেড়ে।

আমি বেঁচে থাকব আশ্বিনের আশায়
আমি জেগে থাকব শরতের আগমনী গানে।
একটু একটু করে বেঁচে থেকে ঠিক পৌঁছে যাব
তোমার অনন্ত অভিসারে।

বিশল্যকরণী ও কৃষ্ণকীট
(করোনাকালে লেখা)

স্বেচ্ছা কারাগারে আজ কি অফুরন্ত আয়োজন
বৃষ্টির আলাপনে শুধুই সৃষ্টি
কাব্য এবং সন্তান।
মনীষীরা চেয়ে দেখো,
জন্ম নিয়েই ওরা ছুটছে বন্দিশালার বাগানে
বিশল্যকরণীর সন্ধানে।

আমিও মায়া ত্যাগ করেছি-
কাব্য, তোমাকে শেকল ছিঁড়ে উড়িয়ে দিলাম,
কোহিনূর, তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারিনি
সাবালক সন্তানকে যুদ্ধে পাঠালাম।

তোমরা ভেব না,
আমি আজন্ম কারাগারে থাকব না।
প্রিয়তমা শেষ শ্রদ্ধায় বলে গেছে,
‘তোমার সন্তানেরা অমৃতের সন্ধানে রাত জেগে আছে।’
অন্তিমযাত্রায় প্রিয়তমা বলে গেল,
'প্রস্তুত রেখ নতুন স্বরলিপি
তোমার কার্নিশে আমি বুলবুলি হয়ে আসব’

বন্দরে ঝপ ঝপ শব্দ শোনো ওই
জাহাজের নোঙর ফেলছে নাবিক-
তোমাদের উঠোনে উঠে এসেছে ওরা
মাথায় ওদের মাটির কলসে বীজমন্ত্র।
কৃষ্ণ কীটের ভয় কি আর?
ওঠো তোমরা, সূর্য ওঠার আগেই
তোমাদের শেকল ভাঙার গান শুরু করতে পার।

ঘুম ভাঙো করুণাময়
(করোনাকালে লেখা)

জেগে ওঠো, করুণাময়
ঘুম ভাঙো
তুমি সব পারো।
বিপদগ্রস্ত তোমার সন্তানেরা
বিষাদগ্রস্ত আমরা ঘরেই আছি
চেয়ে আছি তোমার ছায়ার দিকে ।
তোমাকে পাই না
তোমার ছায়ার উপাসক আমরা ।
এদিকে তাকাও, ফিরে দেখো মঙ্গলময় -
শ্মশানে জ্বলছে কান্না,
সাতশো কোটির করজোড়
-তোমার জিয়ন কাঠিতে জেগে উঠুক পৃথিবী ।
একবার জাগো, রাজাধিরাজ
ঘুম ভেঙে জেগে ওঠো,
দেখো হে মহারাজ ।
আমরা জেগে আছি প্রার্থনায়
তোমার ঘুম ভাঙার প্রতীক্ষায় ।

বিমর্ষ শহর

(করোনা আবহে লেখা)

জ্বরে পুড়ছে বিমর্ষ শহর
কপালে জলপট্টি নিয়ে জেগে আছে শহর
আতঙ্কে ব্রিজের নিচে আশ্রয় নিয়েছে সিংহশাবক
রাতের শেষ ট্রেন, সেও ছাড়ছে দেরিতে ।
যাত্রীরা প্লাটফর্মে ঢুলছে পুঁথি পাঠের ছন্দে
কেউ কোন কথা বলে না।
ভরা জ্যোৎস্না, সেও চোখে ঠুলি পরেছে ?
এই প্রথম চাঁদকেও কাঁপতে দেখেছি ভয়ে।

ছাত্র যুবাদের বলছি
তোমাকেও বলছি,
- জাগো হে জাগো, ফুরিয়ে যায়নি সময়।
আমিও হাঁটব দুপুরের সূর্য মাথায় নিয়ে
তোমাদের সাথে
রোদ্দুর ছোঁয়া ঘাম চুঁইয়ে পড়ুক
তোমার কপাল কাঁধ উরু পায়ের গোড়ালি বেয়ে রাজপথে
ধুয়ে যাক শহর জ্বর, নাগরিক আতঙ্ক।

অনির্বাণ

(করোনাকালে লেখা)

হরিণ চেনা পথেই ফেরে
হরিণ কখনও রাজপ্রাসাদে আসে না
সিংহের দাপুটে জঙ্গলে একবার সে যাবেই যাবে।

রাজপ্রাসাদে রাজা নেই,
আছে-
একমাত্র নৈশপ্রহরী
পাহারা দেয় রাজার পাদুকা জোড়া,
একথোকা আঙুর সাজিয়ে রাখে রুপোর থালায়
- যদি রাজা ফিরে আসে কোনদিন।
রাত্রি দিপ্রহর-
প্রহরী যুবকের পায়ের শব্দে ঘুম ভাঙে রাজার কন্যার।
এ সংসারের সবাই চলে গেছে রাজার হাত ধরে
পুব থেকে পশ্চিমের অস্তাচলে,
যারাই রাজার হাত ধরে পশ্চিমে যায়
তারা আর ফিরে আসে না
রাতের নক্ষত্র হয়ে যায়।
প্রহরী যুবক রাজকন্যার ঠোঁট ছুঁয়ে বলে,
আমাদেরও যেতে হবে
নক্ষত্রের দেশে।

কেঁদে ওঠে রাজকন্যা,
আমি নক্ষত্রের দেশে যাব না ।
প্রহরী, চলো
আমরা আবার সবুজে সাজাবো মৃত পৃথিবী
সন্তানে ভরিয়ে দেব শূণ্য রাজপ্রাসাদ ।

সাদা রাজহংসের রথে

(করোনাকালে লেখা)

সেদিন ভার্চুয়াল বাসরে
সম্পন্ন হল সতীর শ্রাদ্ধ
মৃতদেহ কোথায়?
সতীর অস্থিকলস কোথায়?
গয়ায় পিণ্ডদান সব হবে
কেঁদো না দাদাভাই।

পাল্টে যাচ্ছে চকোলেটের রং
দুর্গা পুজোর শাড়ির গন্ধ
কুমোরটুলির কলাবউ
ছয় ফুট দূরত্বে নির্বাসিত
কিশোরীর মলিন মুখ।
কাকু, আজ তোমার সাতরঙা ছাদে যাব
রংধনু মাস্ক, ডার্ক চকোলেট
রেখে দিও আমার জন্যে।
মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপে
কিশোরীর কালো চুল আর এক টুকর দুঃখ।
ভয়াল করোনায় ওর মা চলে গেছে
সাদা রাজহংসের রথে।
কিশোরীরা দুঃখ বুঝতে দেয় না।

ঘনায়মান

(করোনাকালে লেখা)

অতিথি আর যুদ্ধবন্দি
এখন সকলেই এক কাতারে।
মধ্যরজনী চিরদিনই একা সায়ন্তনি
সূর্যোদয় চিরদিনই তরতাজা যুবক।
আমি কাউকেই খুঁজতে যাই না আর
রথে উঠতে হবে
রথযাত্রীরা ইষ্টনাম করছে।
অকারণ শক্তি ক্ষয় করো না, অরিন্দম
জমিয়ে রাখো বাহুতে, উরুতে আর মাটিতে ।
অসহায় আর্তকে তুমিই রক্ষা করবে
ক্ষয়িষ্ণু পর্বতমালা তোমার জন্যে জেগে আছে
ক্ষীণ স্রোতটুকু নিয়ে বয়ে চলে শীর্ণ নদী
সেও তোমারই অপেক্ষায়।
ষড়যন্ত্র চলছে ব্রহ্মাণ্ডে
মহাপ্রলয়ের মহড়ায় তুমি বীর
তুমিই গোপন মন্ত্র জানো।
যন্ত্রণায় কাতর দুগ্ধজাত শিশু
স্তূপীকৃত মৃতদেহ অন্ধকারে- শ্মশানে ক্লান্ত পুরোহিত
এর মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নতুন ভ্রূণ
নবজাতক তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে
তাকিয়ে বনের ত্রস্ত হরিণ শাবক
হরিণী চলে গেছে মহানন্দার ওপারে।
রথের শব্দ মেঘের আড়ালে শুনতে পাই
পঙ্খীরাজ ঘোড়া আসছে।
তোমরা থাকবে- বীরভোগ্যা বসুন্ধরা
বীরের অপেক্ষায় বরণডালা সাজিয়ে।

অন্য রোদ্দুর
(করোনাকালে লেখা)

গৃহবধু আর বায়না ধরে না রেশমি চুড়ির
মা আর বলে না,
'খোকা, বেশি রাত করো না'
বিদগ্ধ পণ্ডিত পাড়ার ব্যর্থ কবির মত
চেয়ে থাকে সাদা কফিনের দিকে।
কান্না নেই বিকেলের মৃত্যুমিছিলে
শান্তিতে ঘুম চাইছে নগরকোটাল।

মা চলে গেল মার্চের প্রত্যুষে
করোনা ছোবলের মধ্যে।
না হলে মা বলতো-
'খোকা, মন শক্ত করো, ঠাকুর আছে।'
একটি একটি করে ঝরে যাচ্ছে জীবন্ত কুসুম
স্মৃতির পাথরে লেখা হচ্ছে যোদ্ধার নাম।
মা থাকলে আমার ঘরে উঁকি দিত মাঝরাতে-
'খোকা, রাত জেগে টিভিতে কি দেখো?
ঘুমিয়ে পড়ো, শরীর খারাপ করবে।'
'আমি যে মৃত্যুর পাটিগণিত দেখি মা'
- বলতে পারতাম না।
তমসায় চেয়ে থাকি পুব থেকে পশ্চিমে
প্রার্থনার হাত প্রসারিত করি
ঈশান কোনে,
কৃষ্ণ মেঘে প্রবেশ করেছে আমার হাত।
দু'মুঠো রোদ্দুর দু'হাতে নিয়ে নিয়ে ছুটব
উত্তর থেকে দক্ষিণে
শঙ্কিত জনপদে তুলে দেব নতুন বিশ্বাস
আর একটি নতুন জন্মদিনের জন্যে।

বেড়ি

ঘাটে অনেক নৌকো বাঁধা থাকত সে সময়
এখন অনেক হাঁস দেখতে পাচ্ছি জলে
ওরা এমন খেলছে যেন পুজোর ফুল ভেসে যাচ্ছে
যেন পৃথিবী কোনদিন অশান্ত ছিল না ।
জলের নিচে হাঁসের পায়ে বাঁধা দড়ি
মনিমালা দেখতে পায় না।
মনিমালা হাঁস নিয়ে খেলা করতে পারে না।

ওর গলায় গজমতির মালা
কোমরে রুপোর বিছে
নাভিমূলে হীরের টুকরো
এই মনিমালার পায়েও বেড়ি
কেউ দেখতে পায়নি আজও
ফুল আর অশ্রুতে ঢাকা ।
হাঁসের পায়ে দড়ি জলছবিতে মোড়া
দেখতে পায় না কেউ।

যখন দেখি- মনিমালা হাসছে নিরন্তর
আমার মাথায় আগুনের ফুলকি ।
যখন শুনি- হাঁসের দল খেলছে চিরন্তন
আমার হাত একটি ব্রহ্মাস্ত্র খোঁজে।
সাঁঝসন্ধ্যেয় প্রদীপ রাখে পিলসুজে
মনিমালা আমার পায় ছুঁয়ে প্রণাম করতেই চিৎকার,
-একি, আপনার পায়েও বেড়ি !
আর অপেক্ষা করিনি একদণ্ড
আমরা নৌকোয় পাল তুললাম
বইতে শুরু করলাম উজানে ।

একান্নবর্তি

চেরাপুঞ্জীতে মুষলধারে বৃষ্টি
তুমি শিলংয়ের পাইনের সারিতে
আমি তখন কবিতায় ।
তুমি ভালোবাসো বৃষ্টি
আমার বিচরণ পাহাড়ে।
তুমি গ্লেসিয়ারে খেলা কর বরফে,
চারিদিকে বরফ আর রোদ্দুর ।
আমি তখন
কি ঘুম
কি ঘুম!
দুটো মেরু আমাদের,
তা কি হল?
পৃথিবী তো একটাই
আমাদেরই।

অন্বেষণ

আমার রম্যকবিতায়
তুমি কামিনী, তুমি কাঞ্চন।
ত্রিবেণী স্রোতা যৌবনা তুমি।
তোমাকে খুঁজেছি জেরুজালেমের গথিক গীর্জায়।
তোমাকে খুঁজেছি মরু প্রান্তরে মক্কা মদিনা কারবালায়।
তোমাকে খুঁজেছি আমার অশান্ত তৃষ্ণায় - পাইনি তোমায়।
পায়ে পায়ে কত উড়েছে ধুলো বইমেলায়
মানুষের ভিড়ে উন্মনা তুমি,
প্রৌঢ় কবির নেশায় গিয়েছ হারিয়ে
পালিয়ে গিয়েছ দ্রাক্ষাকুঞ্জে
ছুটেছ তুমি নাটমন্দিরে- তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।
চিনতে পারিনি তোমাকে সেদিন
চপল আড্ডায় যতই হয়েছ মত্ত-
তুমি ছাড়োনি এ হাত আমার
তখন আমি ধ্যানমগ্ন কাব্য কবিতায় ।
আমার দু'চোখে ত্রিপিটক – বুদ্ধ
বুকের মাঝে বৃন্দাবন - নিঃশ্বাসে আমার মহাকাল নাচে
কোথাও পাইনি তোমাকে ।
আমার হাতের তালুতে তোমার সে হাত ।
দেখেছ বারবার - দেখো আরবার
সাত জনম দিয়েছি পাড়ি
খুঁজেছি কত- পাইনি তোমায় ।

দণ্ড

একটা সুনিপুণ বিশ্বাস চাই
নিভৃত নিরালায় নিঃশ্বাস চাই।
অভাব স্বপ্নের
অভাব পোষমানা স্মৃতির।

সকলেই শেকল ছিঁড়েছে
হাতে লাল সুতো বেঁধেছে যুবক
কালান্তক তন্ত্রসাধনায় মগ্ন পতিপ্রাণা নারী,
আজো কি জানলাম, কেন
আমি পদ্মিনী শঙ্খ খুঁজি !

তোমরাও জানো না-
কোথায় বিশাখা টিনএজ বালিকা ?
কোথায় তার আশ্রয়?
কোথায় রাধিকার সখী!

বিশ্রাম নেই, ওহে লেখক
আমৃত্যু লিখে যাও,
প্রেম ও পূজার বিভেদ রেখো না,
এটাই তোমার দণ্ড ।

আগমনী বার্তা

আমি হতে চেয়েছিলাম দূরন্ত বিপাশা নদি
তুমি হতে চেয়েছিলে শরতের কাশফুল।
তুমি কিছুতেই আমার দুয়ারে পা রাখলে না।

তুমি বললে,
ওগো মনিষী,
কাশবন বাইরে থেকে দেখতে হয়
ভেতরে চোরকাঁটা।
তোমার রূপোলি রক্ত ঝরাবে।

আমি হতে চেয়েছিলাম পাহাড়ি ঈগল
তুমি হতে চেয়েছিলে খরগোশ শাবক
তুমি কিছুতেই পাহাড় চুড়ায় সূর্যোদয় ছুঁয়ে দেখলে না।
তুমি বললে,
দূর থেকে পাথরের গায়ে ছবি আঁকতে হয়
পাহাড়ের সবুজ খাদে নিঝুম মহালয়া
দেবী প্রার্থনায়
তোমাকে নিয়ে ডুবতে ইচ্ছে হয়।

বসন্ত যাপন

মাঘ আমার চিরকালের অধীর ডাক পিওন -
'তোমরা শোনো,
আমি বসন্তের বার্তা নিয়ে এসেছি ।
ওঠো, জাগো।'

শত হাতছানিতেও
আমি বসন্তযাপনের মেঘদূত,
শান্তিনিকেতনে দঙ্গল তরুণ তরুণীর জোয়ারে-
আমি কৃষ্ণচূড়া ।
পলাশ ফুলের স্নান আমার
প্রত্যুষের আকাঙ্খা ।

বসন্ত আহা বসন্ত!
চির বসন্তের স্বপ্ন দেখি আমি চিরকাল
- মড়ক লাগবে না যৌবনে
শুধু অনন্ত পাশা খেলা
অফুরাণ মদিরা পাত্র
মৌমাছি প্রজাপতিরা
আমার চারপাশে গুনগুন
আর আমি ঘুমিয়ে থাকব
বসন্তের গন্ধমাখা সে ঘুম।
স্বর্গের অপ্সরীরা নেমে আসবে মর্তে
আমারই বসন্তকুঞ্জে। ওদের আঁচলের
মৃদু মন্দ বাতাসে নৃত্যগীতের আসরে
রাগ বেহাগ সঙ্গীত বাসরে -
এ বসন্তে আমিই অধীশ্বর।

ভিস্তির থলি

শিশুদের সারিতে কে যায়?
-আমি ভিস্তিওয়ালা,
জল খাবে, জল ?
ও জানে-
ভিস্তির থলিতে ভালোবাসা লুকোনো।

সায়নি একবার বলেছিল,
ফুল ফুটলেই আসন্ন হবে নির্বাসন
খসে পড়বে একটি একটি করে
ভালোবাসার পাপড়ি।
যতক্ষণ কোরকে লুকোনো ভালোবাসা
ততক্ষণ শ্বাস
ততক্ষণ আশ
আর তখনি শঙ্কা 'এই বুঝি হারালাম তোমাকে'।
বুভুক্ষার মত সায়নী দুহাত পেতেছে
যদি একটিবার বর্ষণ নামে
ভিস্তিওয়ালার হৃদয়ে ।
যদি তিরন্দাজ ঝাঁঝরা করে দিতে পারে
ভিস্তির থলি।
ঝুরঝুর করে ঝরে পড়বে ভালোবাসার পাপড়ি
সমস্ত বালিয়াড়ি জুড়ে ।
পাপড়ি মেলে ধরবে ভালোবাসা ।
আমিও একটি পাপড়ি তুলে নেব তোমার অঞ্জলি থেকে ।
বলতো সায়নি, কতদিন অভুক্ত গাছের পাখি,
বনের হরিণ ?
আমরাও কি অসম্ভব রকম ক্ষুধার্ত।
ভুলেই গেছি একপ্রকার-
স্বচ্ছ জল আর ভালোবাসার কথা !

অলীক চিত্র

উদভ্রান্ত জগতে স্বেচ্ছা নির্বাসন
প্রেমের সংজ্ঞায় -
চলতি হাওয়ার ফ্যাশন চলছে একটা
যেন রাশিয়ার নেভা নদিতে নৌবিহার
শীতল বাতাসে পাশে বসা রুশ তরুণীর উত্তপ্ত হাত।
আকাশ কুসুমে অলীক চিত্র নয়তো কি ?
নিজের শক্ত মাটি ছেড়ে ভেসে বেড়ানো
ভাবনার স্বপ্নজালে প্রেমের আকুতি ?

সেই কবে থেকে মানুষ দুঃখবিহারী হয়েছে -
বিরহ আঁকড়ে সুখী থাকার আহামরি স্বপ্ন
কল্পনা বিলাসিতায় চুর হয়ে ডুবে আছে রমাকান্ত।
রমাকান্ত বলে,
'দাদা, এভাবেই নিখরচায় ভালো থাকা যায়
ভালোবাসার এটাই মোক্ষম উপায়'।
নিরুপমার আক্ষেপ,

- 'অনেক তো চেষ্টা করলাম রমাকান্ত,
  মুক্তি দাও এবার ইছামতির জলতরঙ্গ
  লতাগুল্মের মত আঁকড়ে ছিলাম তোমাকে
  এত কাছে রেখে ভালোবাসা যায় না।'

পুনর্জন্ম

একটা অপলক হরিদ্রা ক্ষেত্রে
আমি আর কৃষ্ণসার হরিণ ছুটেছিলাম একত্রে
অনেকটা এগিয়ে থেকেও দিগভ্রষ্ট হলাম
অঞ্জনা তীরবিদ্ধ কৃষ্ণসারের বুকে মাথা রাখল ।
আমি পালিয়ে গেলাম অঞ্জনাকে রেখে।

কোন চিরসবুজ সঙ্গীত সম্মেলনে
আমি গাইতে পারিনি কোনদিন
আমার কণ্ঠে নাকি বর্ষা নামে না
মেঘ ফিরে যায় অন্যপথে ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়েছি
সুর, জ্যোৎস্না আর ঝড়কে জানতে
সহস্রাব্দ কাটিয়েছি সত্তাকে বুঝতে।

অবশেষে -
যখন বুঝেছি সকল লালপেড়ে মরুভূমিই
সরস্বতীর জন্মভূমি,
যখন জেনেছি সেই সক্ষম পুরুষ
যে শঙ্খধ্বনি শুনেই তীরে নৌকো ভেড়ায় না
তখন আমার একটা পুনর্জন্ম হল ।

বন্দুকবাজ

বন্দুকবাজ শুনলেই একটা আকর্ষণ
যুদ্ধ শুনলেই একটা ভালোবাসা
রমণীর ছবি দেখলেই উদার যুবরাজ
বীরত্ব চায় না কেউ।
নারী বিন্ধ্য পর্বতের অহংকার চায়
এদিকে যুদ্ধবাজ কুরুক্ষেত্র খোঁজে ।

অথচ কি বোকার স্বর্গে বাস করে
যুদ্ধবাজ পুরুষ !
-বাম হাতে নারী
ডান হাতে বন্দুক।
বীর বন্দুকবাজ ছুটেছে
আর একটি শিকারের সন্ধানে
চাই একটি রমণী অথবা একটি চিতল হরিণ।

নবাবপুত্তুর

চলুন ধর্মাবতার,
একটা কবিতা লিখি
চলুন একটা ক্ষুধাতুর যাত্রাপালা দেখি
দুজনে,
যখন চতুর দ্বিপ্রহর
সর্বনেশে মৃদঙ্গ বাজে
অসহায় মুসাফির মৃত্যুশয্যায় তখন।
কোথায় তুমি অন্ধ রাজা?
তোমার প্রৌঢ়া রানির কণ্ঠে হিন্দোলী মুক্তাহার।
দেবকী লাবণ্য হারালো স্বর্গের সুড়ঙ্গে,
কৃষ্ণের নিরুদ্দিষ্ট বাঁশির সুর,
- জন্মদায়িনী মা দেবকী,
দেখা দাও সন্তানে।
লুকোনো আস্তিনে নাস্তিক নমরুদ
চতুর্দিক হাহাকার।
আমার গেলাস ভর্তি কুয়াশা
আমি লহরি তুলেছি তুঙ্গে।
কি হেন নবাবপুত্তুর
আমি কি নিষ্ঠুর!
আমি কি স্বার্থপর!

সম্ভ্রম সীমান্তে

নগরপালের একশো একটি অভিনয়
আমি বুক পেতে সয়েছি,
ক্ষত্রিয়ের অসি চালনায়
রক্তের ফিনকি আমি দেখেছি,
চানক্যের নৈশ ইঙ্গিতে দাঁতে কামড়েছি।

চেয়ে দেখো, রাজা
আমি আজ সম্পূর্ণা
আঘাতে আগুনে লজ্জা সরিয়ে
আমি পৌঁছে গেছি মথুরাপুর ।
চেয়ে দেখো
আমার সন্তানেরা নদি তীরে
আমার ঘরে ফেরা যুবক এখন
শহর নগর বন্দরে কারখানায়
আমার ঘরে ফেরা যুবক এখন
ফসলের গন্ধে মাটি মাখা হাতে।

গল্পটা আজ বদলে গেছে
লগ্নভ্রষ্ট আঁধারের অভিশাপ নিয়েছিলাম।
আমার ওষ্ঠে বসতি ছিল ছিনিমিনি রিনিঝিনি,
ক্ষুধা নিয়ে এক কোটি বছর আমি নিদ্রাহীন,
চেষ্টা করেও
আমার চোখে তুমি ঘুম আনতে পারোনি ।
ওরা ছলনা যতই করুক
আমার কটিদেশে
 বিন্ধ্য পর্বতের চিত্র
আঁকতে দেব না আর।

অবাধ্য

পুরুষকে বশে আনতে পারোনি রমনী,
চার যুগেও পারোনি।
দুর্বোধ্য পুরুষ -
মস্তিষ্কে কোজাগরী পূর্ণিমা
শরীরে অবাধ্য হিমশৈল।

পার্বতী,
তুমি পারোনি হিমালয় পর্বতে ছবি আঁকতে ।
দ্রৌপদী,
কুরুক্ষেত্রে তুমি পারোনি ফুল ফোঁটাতে ।
সীতা,
তুমি অগ্নিপরীক্ষায় মেঘবৃষ্টি আনতে পারোনি ।
লিওনার্দো দা ভিঙ্সিকে
তুমি শান্ত করতে পারোনি,
মোনালিসা ।

যতবার প্রকাশকের হাততালি কুড়িয়েছি
ঘরে ফিরে দেখি পাণ্ডুলিপি আমার চোখের জলে ভেজা
মহেঞ্জোদারো সভ্যতা।
মাইকেল অ্যাঞ্জেলো
তুমিও রমণীর অবাধ্য দুর্বিনীত ।
প্রণয়ে তুমিও পাবলো পিকাসোর বীর ?

মৃত্যুহীন আষাঢ় মাস

মৃত্যুই যখনই অনিবার্য উপন্যাস
বেপরোয়া মানুষগুলো ঝাঁপ দিতে আগুন খোঁজে যখন
শুরু হয় নিশি সৈকতে মনিকাঞ্চনের বিকিকিনি ।

আগুন সে তো এই আষাঢ়েই নিভেছে।
বুকের মধ্যে কষ্ট হলে আমিও স্বীকার করি-
বৃষ্টি মানেই ধুকধুক ব্যর্থতা।

পাশে বসা মহিলা কবি বলে উঠলেন,
আষাঢ় মানেই কান্না।
আমি ধমক দিলাম,
চুপ করুন।
না কাঁদলে জন্ম হত আপনার?
আর আপনার কবিতার?

না কাঁদলে মৃত্যুও হবে না কোনদিন।
সৈকত সমুদ্রে কান্নাও যা হাসিও তাই।
দুটোই চোখে আষাঢ় আনে ।
কবিতার চোখ নেই
কান্না নেই পাণ্ডুলিপির
মৃত্যুও নেই কবিতার।
কবি কোনদিনই স্বর্গে যেতে চায়নি
কবিতার হাত ধরে বাঁচতে চায় কবি
হাজার বছর
আদুরি পৃথিবীর রুপোলী এ মাটিতে ।

যত্ন আত্তি

একটু যত্ন চাইলেই
শত অজুহাতে নীরব নীলবসনা ।
নিজেকে কৃপাসিন্ধু ভেবো না সুভদ্রা সুনয়নী,
- অর্জুন যুদ্ধ চায়নি কোনোদিন
সুভদ্রা সুগন্ধে চির মশগুল অর্জুন।
ট্রয় নগরীতে হেলেন এখনও দুর্লভ অর্কিড
দ্রৌপদী তখনও সোনার মোড়কে বাঁধানো সূর্যকন্যা
অধরা তখনও, অধরা এখনও ।

একটু আদর চাইলেই
অজুহাতে কানাকানি অন্দরমহল ।
সকল রমণী লজ্জায় তখন অহল্যা পাষাণী
সকল রমণী তখন জলতরঙ্গ
ভুলে গেছে কথা
ইশারায় অপ্সরা।

সারারাত নিদ্রালু চোখে
ঘুম ভুলে থাকো কল্পনাবিলাসী পুরুষ
এটুকুই আজন্ম বাহাদুরি তোমার।

বাৎসল্য

ঘোর তমসা চরাচরে
কবি বন্ধুদের চিঠি দিয়েছি,
দুর্দিনেই কবিতা লিখতে হবে-
টগবগে সুখের কবিতা লেখো
লেখো আত্মীয় বিয়োগের হরি সংকির্তন।

বিশ্রাম দিও না লেখনীর
বিশ্রাম নিও না ভাবনার
আমরা আছি অক্লান্ত আয়েশে।

ঈশ্বরের অনিচ্ছায় ঘটেছে দুর্বিপাক,
তিনিও অভিমানহত
মন্দির ছেড়ে বের হচ্ছেন না।
ঈশ্বরের দায়িত্ব হাতে তুলে নিক
আপনভোলা কবিরা,
যতদিন দার্শনিকের দরবারে
ঝুলছে তালা।
আমরাই রক্ষক ঈশ্বরের
আমরাই বুকে নেব কবিদের কবিতা।

তিলোত্তমা

যখন কেউ নেই তোমার নিধুবনে
যখন নিঃসম্বল নিঃস্ব তুমি
তখন চোখ মেলে দেখো-
আমিই নটরাজ তোমার চারিধারে।
যখন পূর্ণ তুমি ধনধান্যে কল্পতরু দুর্গেশনন্দিনী
তখন শুধুই শূণ্যতা তোমার অন্তরে অন্তরে
চোখ মেলে দেখো-
কেউ নেই তোমার দোল পূর্ণিমায় ।

বিসর্জনের মাটি দাগ রেখে যায় -
মন্দির গাত্রে, পূজারির নামাবলীতে
কুমোরটুলির ফাটলে
তিলক চন্দনে- সিঁদুর খেলার শাড়িতে।
প্রতি বছর বিসর্জনের কান্না
সে তুমি সইতে পারবে না, তিলোত্তমা ।

তুমি কোনদিন সম্পূর্ণা জগদ্ধাত্রী হতে যেও না
সাষ্টাঙ্গ প্রণামে বিদ্ধ হতে চেও না তুমি ।
অনেক বোদ্ধা তোমাকেই ভালোবাসবে
এবং অনেক যোদ্ধা তোমার ছবি বুকে রাখবে ।

শ্রাবণ স্নান

সাপুড়ে কন্যার সনির্বন্ধ অনুনয়-
প্রশ্ন করি সারথি,
সহজ কোন কবিতা লিখতে পারো না তুমি?
বুঝতে পারি না তোমার
চুড়ি ভাঙার ছন্দ,
বুঝতে পারি না
তোমার কুশলী অসি চালনা,
রমণীর মেরুতে তোমার মরু ঝড়।
দেখেছ তুমি?
নিশি পোহালে
দিশেহারা বুনো হাসনুহেনা?

বসন্ত গেল বৈশাখ গেল
কি আশ্চর্য শান্ত পৃথিবী এখন
ফুলেরা চিঠি লেখে বৃষ্টির কাছে,
বৃন্দাবনও বান্ধবীকে পুষ্পরেণু পাঠায়।

কত ঘুরেছি আমি বিমূর্ত ফুলদানি হাতে -
কত ঘুরেছি আমি সহজ কবিতা ঠোঁটে মেখে-
শ্রাবণ সন্ধ্যায় সে এলো না
সাপুড়ে কন্যাকে আর খুঁজে পেলাম না।

ইউক্যালিপটাস ও মৃণালিনী

কবিতা লিখছ না কেন?
- ইউক্যালিপটাসে হেলান দিয়ে
প্রশ্ন করল মৃণালিনী।

আমি কবিতা লিখিনা
- আমি পিয়ানো বাজানো শিখছি।
আমি কবিতা লিখিনা
- লেখনী এখন সামন্তবাদের প্রভু।
ফিরে দেখি মৃণালিনী নেই
ইউক্যালিপটাস গাছটিও নেই
আমার পায়ের নিচে তপ্ত বালুরাশি
চারপাশে শুধুই মানুষের কান্না।

একটা শ্বেতপাথর পড়ে আছে
লিখে রাখলাম,
কিছুই চাওয়ার নেই আমার
আর যা চাই
সে তো নিষ্পাপ জলপাই পাতা।
একদিন মৃণালিনী এ পথ দিয়ে যাবে
ইউক্যালিপটাসের খোঁজে।

তনয়া বৃত্তান্ত

সমুদ্র মন্থনের কালবেলায়
তুমি ছিলে অন্তঃসত্ত্বা প্রজাপতি
সফেদ ফেনায় স্নানরতা তুমি।

সেই দুপুরে
ত্রিভুবন প্রান্তরে
অমৃত সুধায় মত্ত আমি
সন্তানের ঘুম ভেঙে যাবে-
তুমি ঘুমোলে না সারারাত।
সেই থেকে
রমণীর রাতজাগা ব্রত
সেই থেকে
রমণী রাতজাগা কিংশুক।

রপ্ত করেছ ঘুঙুরে রক্তঝরা,
শিখে নিয়েছ -
কাঁদতে কাঁদতে
কান্না লুকোনোর কারুকার্য।
মায়ের অশ্রু থেকে জন্ম নিল তনয়া -
চিনতে শিখল
চৌকাঠের এপার-ওপারের অন্ধকার।
সেইদিন থেকে
আঁচলের আড়ালে রেখেছ প্রেম
বুকে বেঁধেছ ধারালো ছুরি
নারীসকল
জঙ্গলমহলের জংলিফুল।

স্মৃতির ফাগুন

হাতছানিতে আমি ভীষ্মদেব
আমার বসন্তযাপনে
দরজা খোলে বালিকাবধু ।

আর যখন উৎসবের সুর ওঠে
সব যেন আমার ছেড়ে আসা ইচ্ছেপূরণ
স্মৃতিগুলো আমার পাষাণে বাঁধানো উপন্যাস ।

শান্তিনিকেতনে তরুণ তরুণীর নৃত্যগীতি
যেন নীল জলের তলে সাদা নুড়ির ঝাঁক
যেন পলাশ ফুলের আনন্দস্নান
যেন কালো কোকিলের মায়াপুরি কুহুতান।

নন্দিনী পৌষমেলায় নাচতে পারেনি
বসন্ত উৎসবেরও ছবি আঁকেনি
পরাজয়ের পরাভয়ে ওর পাঁজর শুকিয়ে যায় ।
অমৃতবানী আসে পৌষের হিমেল বাতাসে
নন্দিনী, যেতে দাও ওকে
দরজা খোলা রেখ।

পিতৃবিয়োগের দিন নন্দিনী কাঁদেনি
স্মৃতির মতন বুকভরা যীশু নিয়ে ঘুমোয়
ঘুম আসে না ।
সারারাত নন্দিনী ঘরের দরজা খুলে রাখে
আকাশ ভরা তারার সাথে গান করে
এ ফাগুন থেকে মুক্তি চায় নন্দিনী।

অভিন্ন

আমার ছায়া আমাকে প্রশ্ন করেছিল,
-তুমি কি অমৃতের কন্যাকে চিনতে পারো না?
তুমি কি তোমার অশোক বনের মহিষীকে ভুলে গেছ ?

একদিন হীরকরাজ আমাকে তলব করেছিল দরবারে,
আমি একটা ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলাম রাজনর্তকীর
- শুরু হল কোলাহল- গেল গেল সব গেল ।

রাজা ও সভাসদ তোলপাড়,
শিল্পীমহল মুচকি হেসে গড়িয়ে পড়ে।
লেখকের চোখের জলে পোস্টার লেখা হল-
পতিতা যুদ্ধ করে যৌবনের পর,
রাজনর্তকী শান্তির স্রোতস্বিনী
ওরা যুদ্ধ করে না ।

আমার ছায়াকে বললাম,
'আমাকে ঘৃণা করতে পার না
যেন আমি পুড়ে ছারখার হই ?
শৃঙ্খল ছাড়া আমার হারাবার কিছু নেই ।'

ছায়া আমাকে ভর্ৎসনা করল
পরিত্যাগ করল না ।

বিমূর্ত সংলাপ

সাগরের ঢেউ ফিরিয়ে দেয় দেহ
নদীতীর ফিরিয়ে দেয় সিঁদুরের ঘ্রাণ
তুমি কিছুই ফেরালে না কোনোদিন।

পরকীয়া শুষে নেয় প্রণয়ের শেষ রোদ্দুর
উত্তর চেয়ে নেয় দক্ষিণের মৌসুমী জানালা
তুমি কিছুই চাওনি কোনোদিন।

মৃত্তিকা লুকিয়ে রাখে আমাদের পাপ
জঙ্গল লুকিয়ে রাখে আদিবাসী নারীর সম্ভ্রম
তুমি কিছুই লুকোলে না কোনোদিন -
না তোমার দ্রৌপদীযন্ত্রণা
না তোমার শরীরের স্বয়ম্বরপ্রার্থনা।

ভাদ্র মাসের গান

সারা প্রান্তর খুঁজে ফিরলাম
কাশফুল কোথাও নেই।
দু'হাত প্রসারিত করলাম
তুমি বললে,
'ওদিকে তাকাও- দুর্গা আসছে ওই।'

তুমি বললে,
'তোমার কপালে তৃতীয় নয়ন
তুমি তা জানো না।'
তুমি বললে,
'তোমার হাতে শিবের জটা
অন্য হাতে দেবী দুর্গা
তুমি তা মানলে না।'

তোমাকে বললাম,
ভাদ্র মাস চলে যাবে
দুচোখে বৃষ্টি মেখে নাও।
তোমাকে বললাম,
'শরৎ এসেছে
চুড়ি ভাঙার গল্পটা লিখে যাও।'
তুমি কাশবনে সেই তো হারালে
একটা গল্প লিখলে না।

ক্রীতদাসী

ইচ্ছেগুলোকে নির্বাসন দিতে পারিনে
একমাত্র জানলাটাও বন্ধ করতে পারিনে
গান্ধারী তুমিই বল,
ওরা কি তোমার মতো ক্রীতদাসী?

ক্রীতদাসীরও বুকে ছলাৎ করে হৃৎপিণ্ড,
চোখের পাতায় স্বপ্ন নাচে রঙিন
আমি বনের পাখিকে ব্রতচারী নাচ শেখাব
আমি খাঁচার বুলবুলিকে জল দেব দানা দেব।
আমি যে অন্ধ সেনাপতি-
বাড়ির উঠোনে তুলসীতলা
চরাচরের বাউলগান
দুইই চাই, দু'বেলাই চাই।

একটা শেকল বয়ে ঘুরছি তো ঘুরছি
যখন পেলাম শান্ত শীতল ঝর্ণা
দু'হাত বাড়ালাম
ঝর্ণা বলে উঠল, হবে না বন্ধু হবে না,
আমার নিরাবরণ শরীরে দৃষ্টি দিও না
ধৃতরাষ্ট্রের রঙমহলে তোমার ঝর্ণাস্নান
হবে না,
আমারও শেকল চেপে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে
আমিও প্রভুর ক্রীতদাসী।

আমার জানলাটা ঝুরঝুর ঝরে পড়ল ভূতলে,
ক্রীতদাসী প্রভুর স্নানের তোয়ালে এগিয়ে দিল
লজ্জাহীনা ময়ূরীর মতো।

কুলীন বার্তা

হাতে হাত রেখে মৃত্যুকে দেখেছো কখনো?
তোমাদের জন্মই বৃথা, সুখী দম্পতি ।
কৌলীন্য কোথায়, শান্ত নিশি যাপনে?
ভুলে যেও না তান্ডব ছাড়া তৃষ্ণা মেটে না ।
যুদ্ধ ছাড়া পঞ্চপাণ্ডব পায়নি ওদের মেদিনী।

ছোট্ট বালক কত কেঁদেছে
ওর মা ফিরে আসেনি।
রাত জেগে শুশ্রুষা করেছে,
বাবাকেও ফিরে পায়নি পায়নি তনয়া।
ভিক্ষাপাত্রে প্রেম আসে না,
হতভাগ্য সে যুবক।

রমনীর পদতলে বসে ছবি আঁকছো কার?
নদীর?
লক্ষী সরস্বতীর?
হাঁটু গেড়ে করুণা ভিক্ষা করো না।
এক হাতে মৃত্যু
অন্য হাতে রমণী
তবেই না সুখী দম্পতির চিত্রকলা।
সিংহদরজা ভেঙে ফেল
নারী ও নদী দুইই তোমার অপেক্ষায়।

সরোবর তীরে

সরোবরের দিকে ছুটে গেল নব্য পুরুষ
টলটল মিষ্টি জলে নিশি পদ্ম ফুটেছে
সরোবরের বাঁধা ঘাটে নগরকন্যারা এলোকেশী।
নব্য পুরুষ তখন জানত-
আমিই পরমারাধ্য বীর
এই সেই চূড়ান্ত লীলাভূমি।

যেই শরীরের নোনা ধুয়ে গেল
নগরকন্যার ঘ্রাণে
জলপাই গন্ধে উত্তাল সাগরের ঢেউ
ভুলে গেল যুবা সরোবরের সব গল্প ।
সেদিন থেকে সাগর পাড়ে লবন খনির শ্রমিক সে।

ভুলে গেছে যুবক - খেলার সাথীর ফ্রকের নীল রঙ।
ভুলে গেছে কৈশোর,
ভুলে গেছে কিটসের নাইটিংগেল।
এখন চুরুটে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, চোখে তুলনা-
সরোবর আর সাগরের।
মুঠোয় অশান্ত রমণী আর আঙুলে হিরের আংটি ।

এখন অন্য কিছু চাই না- পেয়ে গেছি-
সব পেয়েছির লীলাভূমি
রুমালে বিবস্ত্র শীতের গন্ধ
জিবের ডগায় ডুবসাগরের নোনা স্বাদ।
মস্তিষ্কে এখন দাপিয়ে বেড়ানো ছুটন্ত ঘোড়া
রক্তে রমনীর জন্যে সজ্জিত রণসম্ভার ।
প্রেম বলে মর্মান্তিক কিছু নেই
সে ছিল সত্যযুগের এক ঘুম পাড়ানী গান ।

সঙ্গী

বেশি কিছু লাগে না জীবনে
সামান্য ব্রেকফাস্ট
বা
শুধু লেবু জল
আর অতি সামান্য কিছু রাত জাগা।

দিন চলে যাবে কাজ আর সমর্পণে,
দুপুরের খাবার না হলেও, চলে যাবে দিন।
রাত কেটে যাবে সঙ্গী থাকলেও
না থাকলেও।

যে সঙ্গী নিয়ে এত লক্ষ কবিতা
যে সঙ্গী নিয়ে এত টানাটানি
এত কানাকানি
চোখের জল অথবা লিকার চায়ের মত
সঙ্গী বা সঙ্গিনী চিরকালই ক্ষণজীবী আগন্তুক।

আপদ

শুনেছি ঘরকুনোরা নাকি সুপণ্ডিত হয়
বাউণ্ডুলেরা আদতে প্রভুভক্ত সারমেয়
পণ্ডিতেরা সাধন ভজন ভালোবাসে না।
অভুক্ত নারী মধ্যরাতেও তুলসীগাছে সুতো বাঁধে
ক্ষুধার্ত বাবুই পাখি স্ফীতগর্ভ শস্যক্ষেত ভালোবাসে।
কেন যে এত ভালোবাসাবাসি,
এক প্রাণহীন কাগুজে বোগানভিলা?
কেন যে তেঁতুল পাতায় তেরোজনের বাস ?
একই আওয়াজ সর্বত্র, 'আমরা স্বজন' ।

যখনই বললাম, 'আমাকে নেবে?'
তেঁতুল পাতা কেঁপে উঠল
তুলসীগাছ আর সারমেয় ভয়ে কুঁকড়ে গেল
অভুক্ত নারী, 'পারব না, আমি পারব না' শব্দ করল
বাবুই পাখি ওদের বলল, 'সাবধান
তছনছ করে দেবে এ বাসরঘর' ।
ওদের বোঝালাম, 'আমি এক ঘরকুনো ।
সুপণ্ডিত নই মোটেও ।'
ওরা বলল, 'ভালোই তো ছিলাম,
এ কোন আপদ, আমাদের ঘর ভাঙবে নিশ্চয়।'

কান্না

দুঃখ এক বকুল বিছানো উষ্ণ বদ্বীপ
পুতুলের বিয়েতে যার জন্ম ।
সুখ সে খোলা বারান্দার দোলনা
যার কোলে ঝুরঝুর করে খসে পড়ে পলেস্তারা।

কাছে পাওয়া ?
সে এক আদুরে শিউলিতলা
নববধূর জ্বালানো সান্ধ্যপ্রদীপ।
আমি জানতাম
দূরে গেলেই তুমি অরুন্ধতী তারা
সব ভুলে যাওয়া পোষ না মানা তোতা পাখি ।
তুমি
আকাশ থেকে ঝুলে পড়া দীর্ঘ চুলের
উদাসী নারী ।
আমি জানি
তুমি নিজের জন্য কখনো কাঁদো না ।

মৃত্যুহীন রাত্রিবাস

বিনিদ্র রজনী স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠল ।
ঘোর অন্ধকার সরিয়ে দুষ্প্রাপ্য এক সূর্যোদয় পেলাম ।
মৃত্যুহীন পদতলে রাত্রিবাস অমৃতের স্বাদ এনে দিল

প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে এনেছি

তীর্থে মঠে মন্দিরে যা পাইনি

মায়ের চরণ চুম্বনে তাই পেলাম

আমার মুকুটে একি স্বর্ণপালক প্রাপ্তি !
ঈশ্বরপ্রাপ্তির আনন্দকে অতিক্রম করে গেল
মায়ের মুখের হাসি-
জীবনে ফিরে আসার হাসি, মৃত্যুর দ্বার থেকে।
এ পৃথিবী দর্শন করেছিলাম যার অপার কৃপায়
তিনি ফিরলেন খাদের কিনার থেকে ।
যেও না মা-
কাতর শব্দধ্বনি তার অন্তরে পৌঁছে গেল।
তিনি জেগে উঠলেন ঘনকৃষ্ণ মরণ রেখা ছিঁড়ে
হতাশার রুদ্ধদ্বার ভেঙে ।

নির্ণায়ক

পৌষের সুগন্ধ আমাকে শুভেচ্ছা জানায়
সোনালী ধান আমাকে সুসমাচার দেয় -
চাষীর বউ বড়ো ব্যস্ত
চাষীর ঘরে পিঠে পুলি।
মহল্লার মোড়ে যুবা-বৃদ্ধ
উষ্ণ মাফলারে আজ রবিবার,
আজ সকালে চায়ের কাপে সুখের চুমুক,
ডুবে যাচ্ছি
সেই কবে থেকে
আমি ডুবে যাচ্ছি অনর্গল ।
বেথলেহেমের আস্তাবলে
হীরকদ্যুতি -
তখনো ছিল নিদারুণ এক শীতকাল ।
মাতা মেরীর পরিচর্যায়
সেই তো সকাল
সেই তো সেই যুবক রাখাল।
যতই দেখি দখলদারী
বেদবেদান্তের পাতায় পাতায়
যতই আমি খুঁজতে থাকি
কে কতটা অসহায়।
পরমাত্মা কথা কয়-
এ চরাচরে আমিই একা
আমিই তো সেই বিশ্বরূপ।

উপলব্ধির তেপান্তর

সকল লীলায়িত বাধা আমি চূর্ণ করি
যেখানে যা পাই।
একদিন হিমালয় মিশিয়ে দেব মাটিতে
যেন কুমারীহৃদয়ে ফুল ফোটে নির্ভয়ে
সেখানে যাবোই একদিন ।
এই, শুনেছ প্রতিবেশিনী,
তোমাকেও নিয়ে যাব ।
এই যে শুনেছ তোমরা তীর্থযাত্রীরা,
তোমাদেরও নিয়ে যাব আমি।

কোথায় গেল
সে নিভৃত যৌবনের সাধনা !
কোথায় আছে পৃথিবীর অসবর্ণ গল্পগাঁথা !
এক ঝাঁক বকুল স্নানের অর্ঘ্যদান !
কোথায় গেল এরা, বসন্তকুমারী, বলতে পার ?
পারবে নিজেকে উৎসর্গ করতে ?

'আমাকে একটু স্পেস দেবে না, রোহিত?'
- বসন্তকুমারীর অহোরাত্র যন্ত্রণা ।
'জনতা কবে বুঝবে আমাদের ?'
- রাতের বিলাপে বিষাদগ্রস্ত দলপতি ।
'ঈশ্বরের ধারণাটাই পেলাম না আজও'
- বুড়ো দার্শনিক মরেই গেল হতাশায়।

আমি মরব না ।
একশো বছর পরেও আমাকে দেখতে পাবে
আমি জন অরণ্যে মৃত্যুহীন কাপালিক
- সাদা ফুল হাতে তোমাদের সম্ভাষণ জানাচ্ছি ।

একশো বছর পরেও তুমি আমাকে খুঁজে দেখো
হে প্রিয়তমা ।
অন্তহীন কামার্ত চোখে তোমার ঘোড় সওয়ার আমি
আম দরবারে সজীব সমর্থ পিয়ানো বাদক আমি
তখনও একই রকম
তোমার অবিকল অন্তরঙ্গ দার্শনিক আমি ।

দূরত্ব

বিশ্বাস থেকে ভালোবাসায় পৌঁছতে
পরিক্রমায় অনেকটা পথ।
বিয়ের পিঁড়ি থেকে বাসরঘর যতটা পথ
ফিরতে হবেই একসময়
বাধ্য উপকুলের মত
এটাই এখন আমাদের সংসার।

মঞ্চ থেকে জনগণ
মাঝখানে প্রলাপ ঘেরা ঘাসহীন মাঠ ।
নারী থেকে ভূমিষ্ঠ সন্তান-
বিস্তীর্ণ জলভূমিতে সাঁতার
তারপর
ত্রিপলে ঢাকা সুচারু আচার আর বাধ্য আচরণ।
-এটাই একমাত্র পুস্পস্তবক হতে পারে না ।
জানালায় কিশোরীর অপেক্ষা
পঞ্চবটীতে সীতার করুণ বনবাস
অথবা নিজগৃহে দ্রৌপদীর কারাবাস
এসব নিয়ে বেসুরো কবিতা লিখব না এখন ।
কারণ এখন তোমার আর আমার মাঝে
অফুরাণ সময় আর অনেক দূরত্ব ।

এক অস্তবেলায়

তারপর যখন সূর্য অস্ত যায়
কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ
রেখে যায়
সাগর সৈকতে,
যদি কেউ কুড়িয়ে পায়!
যদি কেউ পেয়েও হারায়!
যদি কেউ চিনতে না পায়!
কিছুই যাবে না বৃথা-
আমি যে তোমার সবখানে ছড়িয়ে ।
- ভুল ?
- জমাটবাঁধা ভালোবাসার মত ভুল ?
তুমি তো জানোই আমার আদ্যপান্ত,
আমি আমাতেই আত্মাহারা চিরঞ্জীব।
দেবো না ধরা কোনোদিনই
কোন সোয়েটার জড়ানো ঠান্ডায়
কোনো শিশিরসিক্ত কান্নায়।
আমি গান গাই একলা
আমি দিগন্ত খুঁজি নির্জনে
আমি অস্ত যাই দিঘার ঝাউবনে
আমি জেগে উঠি উদয়ের রঙিন স্বপ্নে।
দেখো সেদিন
চিনতে পারো কি না ।
একটি শিশির কণা তখনো চিকচিক-
কোনো কিশোর ঝাউশাখে।

দণ্ড

একটা সুনিপুণ বিশ্বাস চাই
নিভৃত নিরালায় নিশ্বাস চাই।
অভাব স্বপ্নের
অভাব পোষমানা স্মৃতির।

সকলেই শেকল ছিঁড়েছে
আত্মীয়তায় লাল সুতো বেঁধেছে যুবক
কালান্তক তন্ত্রসাধনায় মগ্ন পতিপ্রাণা নারী,
আজো কি জানলাম, কেন
আমি পদ্মিনী শঙ্খ খুঁজি !
তোমরাও জানো না-
কোথায় বিশাখা টিনএজ বালিকা ?
কোথায় তার আশ্রয়?
কোথায় রাধিকার সখী!

বিশ্রাম নেই, ওহে লেখক
আমৃত্যু লিখে যাও,
প্রেম ও পূজার বিভেদ রেখো না,
এটাই তোমার দণ্ড ।

স্বেচ্ছাচারীর পাঁচালী

কবি জন্মেছেন
পাষাণী বুকে ফুল ফোঁটাতে,
লিখতে লিখতে কবির মৃত্যু।
জীর্ণ শয়ানে শেষ প্রশ্ন রাখেন তাম্রপাত্রে-
কি পেলাম আমি?
লক্ষ জনতার চিৎকার
-সহস্র বৎসর পরমায়ু তোমার।
স্পার্টাকাসের শেকলে বাঁধা তোমার হাত।
রবিঠাকুরের শয্যাপাশে
তোমার শয্যা পাতা।
খ্যাপার বাঁশীতে তোমার বোল
বাউলের এক তারাতে
তোমার বিরহ সঙ্গীত।
মৃত্যু নেই মহুয়ার নেশায় শুধুই জীবন,
শুধুই অনন্ত যৌবন।
বইমেলায় মিষ্টি বোষ্টোমীর গান,
ব্রজধামে পাগলা গোঁসাই বংশীধারী।
লেখক, তুমি সবার চোখে চোখাচোখি প্রেম-সওদাগর,
তুমি চাঁদ সওদাগরের চোখের মনি।
অমৃতের আখড়ায় তোমার বাউল সুধা।
শতবর্ষ পর
তখনো জ্বলজ্বল তোমার নাম, অভিজাত দুপুরে
কোন সে বিদেশীনী তন্বী, টেমস নদীর পাড়ে-
তোমার অনুবাদের সোনালী ঢেউ,
উষ্ণ ঠোঁটের ছোঁয়ায় দৃষ্টি হারায় সহস্র যুবক।
ভুলোমন লেখক, ভুলে যেও না, এ বিশ্বময়
তুমি পাঠকের ক্রীতদাস।
= সমাপ্ত =